কোনো কোষবিন্যাস করে বেঁচে থাকবে। এ কোষের ক্রমাগত উন্নয়ন যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয় তা হলে যে জিনের পরাগে মানুষ সৃষ্ট হবে আগামীতে তাঁর যৌবনকাল দাঁড়াবে সুদীর্ঘ, হতে পারে ধীরে ধীরে নিজ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে। NSSA যুগে প্রথমে ১০০, তারপর ধীরে ধীরে ১৫০, ২০০, ৩০০, ৪০০ বছর পর্যন্ত মানুষের প্রজাতির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে, তবে বর্তমান এ যুগের পতনের পূর্বে নয়, এ যুগে মৃত্যুর মাঝে শেষ হলে পর ধীরে ধীরে সেই ডিএনএ বা জিন এর মহাজাগতিক দেহাবয়বের যুগ শুরু হবে। মানুষের দেহ শুধু নয়, জীবনধারণেও এর আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। সেই একই পদ্ধতিতে সকল প্রাণবৎ, জীবকূল ও উদ্ভিদকূলে আসবে মহা NSSA যুগের পরিবর্তন। এমনি এক আগামী দৃষ্টি হাতছানি দিচ্ছে গোটা মানব সমাজকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগেঃ মানুষ জীব ও উদ্ভিদ সমন্বয়ে নতুন আরেক জিন বিশিষ্ট প্রজাতিতে রূপান্তরিত না হয়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এমন প্রসার ঘটবে এই NSSA যুগে যাতে মানুষের আগামীতে ওয়্যারলেস সেট বা কম্পিউটারের কতগুলো সাংকেতিক শব্দ বা চিহ্নের প্রয়োজন হবে শুধু। বাকি যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষ নিজেই স্বরূপে বা অদৃশ্য রূপে সম্পন্ন করবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, NSSA যুগ হলো রক্তমাংসের সেই বরফ যুগ বা প্রস্তরের আদি যুগ বলি সেই মানুষটির সর্বশেষ রক্তকণিকার দৌড়। এর বাইরে রক্তসাংসের মানুষের যাবার ক্ষমতা নেই। সে সহায়ক শক্তি, যেমন-কম্পিউটার তৎসহ যান্ত্রিক ব্যবহার করে আরও উন্নতি করবে ঠিকই, কিন্তু নিজে থেকে যাবে সসীম, ফলে তাঁর সৃষ্টিতেও থাকবে সীমাহীন সন্দেহ ও সতর্কতা। এই NSSA যুগে মানুষের বেশির ভাগ মৃত্যু হবে মানুষের দ্বারা। মহামারি, দুর্ভিক্ষ, নৈসর্গিক দুর্বিপাক যত প্রাণ নাশ করবে তার চেয়ে বেশী করবে মানুষ মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। ফলে মানুষ স্বভাবত,আর সেই মানুষটি, ভালবাসা স্নেহ, পবিত্র, মধুর মৃদু স্বভাবটি "Humaní" থাকবে না-হয়ে যাবে অন্য কিছু- না মানুষ, না দেবতা। না উদ্ভিদ না জীব। না পশু না স্বর্গীয়। না দৃশ্য না অদৃশ্য এমনিতর হয়ে যাবে NSSA-'র আগামী প্রজন্ম। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ আর মানুষকে আটকে রাখতে পারবে না, ব্যক্তি মতাদর্শই স্ব স্ব ক্ষেত্রে হয়ে যাবে সার্বভৌম। আমরা এই SSA যুগের মানুষঃ যা চলবে আগামী ২০১০ সাল নাগাদ। আমরা সবাই অত্যন্ত ভাগ্যবান, যারা ১৯০০ সাল থেকে ২০০০ সালে হয়ে ২০০১ সাল পড়বো-কিন্তু একই সময় আমরা ভয়ানকভাবে অভিশপ্তও বটে।

সৌজন্যেঃ সাপ্তাহিক অহরহ

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১(৩৪)ঃ বড় ভাই পাঁচ হাযার টাকায় একটি ছাগল কুরবানী করল, আর ছোট ভাই চার হাযার টাকায় দু'টি ছাগল কুরবানী করল, এদের মধ্যে কার ছওয়াব বেশী হবে।

মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
গ্রামঃ গড়ের ডাঙ্গা
পোঃ সেনের গাতী
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহান রব্বুল আলামীনের নিকট নিয়ত ও ইখলাছ অনুসারে বান্দার আমল গৃহীত হয়ে থাকে এবং সে অনুপাতে বান্দা নেকী পেয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে একমাত্র খাঁটি নিয়ত ও ইখলাছ সহকারে আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলা হয়েছে' (সূরা বাইয়্যেনাহ, ৫)। অনুরূপভাবে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের যাবতীয় আমলের ফলাফল তার নিয়তের উপরেই নির্ভরশীল' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ১)। এছাড়া বিশেষভাবে কুরবানীর বিষয়ে তো পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 'এগুলোর (কুরবানীর) গোস্ত আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না। আল্লাহ্র নিকট একমাত্র পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া' (সূরা হজ্জ ৩৭)।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কে কত বড় ও কত সংখ্যক কুরবানী করল সেটি আল্লাহ্র নিকট তেমন বিষয় নয়। আল্লাহ্র নিকট মূল বিষয় হচ্ছে এই যে, কুরবানী দেওয়ার মূলে বান্দার ইখলাছ ও তাক্বওয়া কিরূপ? সে অনুপাতেই তিনি বান্দাকে নেকী প্রদান করবেন। সুতরাং বান্দা তার ইখলাছ ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতেই বিবেচনা করবে যে, সাধ্য অনুযায়ী তার কুরবানী কিরূপ ও কত সংখ্যক হওয়া চাই।

অতএব পাঁচ হাযার টাকায়' একটি কুরবানী ও চার হাযার টাকায় দু'টি কুরবানীর মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক নেকী প্রাপ্ত হবে যার ইখলাছ ও তাক্বওয়া অধিক হবে। যদি দু'জনেরই ইখলাছ ও তাক্বওয়া সমান হয় তবে দু'জনের-ই সমান নেকী হবে। আর তাক্বওয়ার মান নির্ণয়ের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

প্রকাশ থাকে যে, কুরবানীর পশুর প্রতি লোমে একটি নেকী হাছিল হওয়া, কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর, লোম ইত্যাদি ওজন হওয়া সম্পর্কিত ফযীলতের আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজা'র হাদীছগুলির সনদ যঈফ (আলবানী, মিশকাত, 'উযহিয়া' অধ্যায় হা/ ১৪৭০ ও

১৪৭৬ -এর টীকা দ্রষ্টব্য)। ফলে এর ভিত্তিতে কুরবানীর নেকী নিরুপন করা উচিত নয়।

প্রশ্ন-২(৩৫)ঃ কোন ব্যক্তি যদি কাউকে এই চুক্তিতে ঋণ প্রদান করে যে, ঋণ গ্রহীতা যতদিন তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন যাবৎ সে ঋণ গ্রহীতার প্রদত্ত বন্ধক জমি ভোগ করতে থাকবে। ইহা শরীয়তে বৈধ কি-না? যদি না হয় তবে কিভাবে বন্ধক রাখা বৈধ হবে? দলীলসহ উত্তর দিলে উপকৃত হব।

মুহাম্মদ ফযলুর রহমান
গ্রামঃ গড়ের ডাঙ্গা
পোঃ সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ ঋণ গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বন্ধক জমি ভোগ করা অবৈধ। যদিও বন্ধক প্রদানকারী স্বেচ্ছায় অনুমতি প্রদান করে। কেননা এরূপ বন্ধক বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া নিঃসন্দেহে সুদের অর্ন্তভুক্ত। আর যদি বন্ধক বস্তু এমন ধরণের হয় যাকে অটুট রাখতে হ'লে তার পিছনে শ্রম ও অর্থ ব্যয় আবশ্যক, তাহলে শুধু শ্রমের মজুরী ও অর্থ ব্যয় পরিমাণে বন্ধক বস্তু হ'তে উপকৃত হ'তে পারে। তার বেশী নয়। কেননা বেশীটুকু সুদ হিসাবে গণ্য হবে। দলীলস্বরূপ কতিপয় হাদীছ ও বিদ্বানদের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল-

'হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, ব্যয় অনুপাতে বন্ধক জন্তুর উপর আরোহণ করতে পারবে এবং ব্যয় অনুপাতে বন্ধক দুধ দানকারী পশুর দুধ পান করতে পারবে'।

হযরত মুগীরা (রাঃ) ইব্রাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণনা করেন, 'কুড়িয়ে পাওয়া পশুর চরানোর খরচ অনুপাতে আরোহণ করতে ও দুধ দহন করতে পারবে এবং বন্ধক কৃত পশুর ক্ষেত্রেও অনুরূপ'।

সাঈদ বিন মানছুর মুত্তাছিল সনদে বর্ণনা করেন যে, চরানোর খরচ পরিমাণ বন্ধক কৃত পশুর উপর আরোহণ করতে ও সে অনুপাতে দুধ পান করতে পারবে'।

হাম্মাদ বিন সালামা তার 'জামে' গ্রন্থে ইব্রাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণনা করেন, যখন কোন ছাগল বন্ধক রাখা হবে বন্ধক গ্রহণকারী ছাগলের চরানোর খরচ পরিমাণ দুধ গ্রহণ করতে পারবে যদি সে চরানোর দামের অধিক পরিমানে ছাগলের দুধ গ্রহণ করতে চায় তবে তা সুদ হবে (বুখারী, প্রথম খন্ড পৃঃ ৩৪১; ফাতহুল বারী ৫ম খন্ড পৃঃ ১৪৩-৪৪)। সাইয়্যেদ সাবেক বলেন, 'অনুমতি পেলে বন্ধক গ্রহণকারী বন্ধক হ'তে লাভবান হ'তে পারবেন (ফিকহুস সুন্নাহ ৩য় খন্ড পৃঃ ১৯৯৬)। মুহাদ্দিছগণ ও চার ইমামের অভিমতও তাই রয়েছে।

সুতরাং, শরীয়ত সম্মত বন্ধক এই যে, ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা স্বরূপ বন্ধক রাখতে হবে এবং ঋণ ফেরত পেলেই বন্ধক হুবহু ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু বন্ধকী জমি বা বস্তু হ'তে লাভ বা উপকার গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন-৩(৩৬)ঃ বর্তমান সরকার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানসহ ইউ পি কাঠামো তৈরী করেছেন। এই ইউ পি কাঠামো ইসলামে স্বীকৃত কি-না? এবং এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা উচিৎ হবে কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিলে খুশী হব।

মুহাম্মাদ সুলতান মাহমুদ
সম্পাদক, পাকুড়িয়া এতীম খানা
ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আমাদের দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো ও প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো ও নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শুধু তাই নয় বরং ইসলাম ধ্বংসের অত্যন্ত কার্যকরী পথও বটে। বর্তমান সরকারের নির্বাচন পদ্ধতি যেহেতু প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায় এবং ইউ পি নির্বাচন ও ইউ, পি কাঠামোতে মহিলা মেম্বার ও ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ তারই একটি অংশ, কাজেই শুধু পৃথকভাবে মহিলা নিয়োগের বিষয়টিকে দেখার অবকাশ নেই। বাকী রইল মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার ব্যাপার। শারঈ দৃষ্টিকোণে তা বৈধ নয়। কেননা ইসলাম মহিলা নেতৃত্বকে ভৎসনা করেছে। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' (সূরা নিসা ৩৪)। আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, 'কেস্‌রার কণ্যাকে পারস্যবাসীগণ তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেছে এরূপ সংবাদ যখন নবী (ছাঃ) -এর নিকট পৌঁছল নবী (ছাঃ) বলে উঠলেন, সেই সম্প্রদায় কখনো সফলতা লাভ করবে না যারা তাদের নেতৃত্ব কোন মহিলার হাতে সমর্পণ করে' (বুখারী ২য় খন্ড ৬৩৭ পৃঃ)।

অতএব, মহিলাদেরকে নিজ নিজ গন্ডীর মধ্যে থেকে নিজ নিজ প্রতিভার বিকাশ ঘটানো উচিত এবং ইসলামের দেওয়া কল্যাণমন্ডিত রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামো প্রবর্তন ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নিবার্চন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য মুসলিম রাজনীতিকদের অবশ্যই সোচ্চার হওয়া উচিত।

প্রশ্ন-৪(৩৭)ঃ সাহরীর আযান সম্পর্কে শরীয়তের অনুমোদন আছে কি? বর্তমানে সমাজে প্রচলিত সাহরীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করা ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত কি?

মুহাম্মাদ আলমগীর
প্রভাষক, জামতৈল ডিগ্রী কলেজ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সাহরীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বেলালের আযান তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া থেকে কখনোই যেন বাধা না দেয়' (মুসলিম, ১ম খন্ড ৩৫০ পৃঃ; মিশকাত ৬৬ পৃঃ)।

ইবনে ওমর হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বেলাল রাতে (সাহরীর) আযান দেয়। তোমরা ততক্ষণ

http://islaminonesite.wordpress.com

পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুমের (ফজরের) আযান শুনতে পাও' (বুখারী ১ম খন্ড ৮৬ পৃঃ; মুসলিম ১ম খন্ড ৩৪৯ পৃঃ; নাসাঈ ১ম খন্ড (৭৫) পৃঃ; মিশকাত ৬৬ পৃঃ)।

উক্ত হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য ফজরের আযানের পূর্বে সাহরীর আযান দেওয়া উচিৎ। এছাড়া সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারন জনগণকে জাগাবার জন্য প্রচলিত নিয়মে সাহরীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করা ইত্যাদি শরীয়ত পরিপন্থী ও মনগড়া কাজ। বিশেষ করে সাইরন ও পটকা ফুটানো ইয়াহুদীদের আচরণ (বুখারী ৮৫ পৃঃ; হাফেয আইনুল বারী, ছিয়াম ও রামাযান ৪৪ পৃঃ)।

প্রশ্ন-৫(৩৮)ঃ বর্তমান সমাজের মাযহাবী ফের্কার উৎপত্তি কখন থেকে এবং এর পরিণতি কি?

মুহাম্মাদ ছাদরুল আনাম
উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম

উত্তরঃ ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমানের (রাঃ) খিলাফাতের শেষ দিকে বাহ্যিক মুসলমান ইহুদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা-এর কুটচক্রে মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম সাবাঈ ও ওছমানী দু'দলের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্রোহী সাবাঈ দলের হাতে তৃতীয় খলীফা শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তীকালে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া(রাঃ)-এর মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খারেজী ও শী'আ ফের্কার উৎপত্তি হয় ও পরে এটি মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয়। এরপরে তাকদীরকে অস্বাকীরকারী কাদারিয়া মতবাদ ও তার বিপরীত অদৃষ্টবাদী জাব্‌রিয়া মতবাদের জন্ম হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে সৃষ্টি যে প্রচলিত তাকলীদের উদ্ভব ঘটে, যা চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয় (দ্রঃ শাহ অলিউল্লাহ হুজাতুল্লাহিল বালিগাহ 'চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা শীর্ষক' অধ্যায়) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) (৮০-১৫০ হিঃ), ইমাম মালেক (৯৫-১৭৯), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) (রহঃ), প্রমুখ ইমামগণ এজন্য দায়ী ছিলেন না। বরং তারা সকলেই তাদের অনুসারীদেরকে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে বলে গেছেন (শা'বানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩ পৃঃ)। ফের্কা বন্দির পরিণতি খুবই মারাত্মক। এক্ষেত্রে মহানবী (ছাঃ) বলেন, বানী ইস্রাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে এদের একটি ব্যতীত সকল ফের্কা জাহান্নামে যাবে। নবী (ছাঃ) কে সকলে জিজ্ঞেস করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত সেই দলটি কারা? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবাগণ যে আদর্শে রয়েছি ঠিক সেই আদর্শের অনুসারী হবে যারা (তিরমিযী মেশকাত পৃঃ ৩০)।

প্রশ্ন-৬(৩৯)ঃ সাধারণভাবে জানি যে, চাঁদ দেখে ছওম রাখতে হয় ও চাঁদ দেখেই ঈদ করতে হয়। ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ তারিখ পূর্ণ করে নিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে, ৮/১০ মাইলের মধ্যে চাঁদ দেখার কোন খবর না পেলেও এবং ৩০ দিন পূর্ণ না হলেও রেডিও'র সংবাদ অনুযায়ী ছওম রাখা হয় ও ঈদ পালন করা হয়। ইহা কি কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে ঠিক? প্রমাণসহ উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল ওয়াজেদ
পাঁচ পটল
টাংগাইল।

উত্তরঃ চাঁদ দেখে ছওম রাখতে হবে ও চাঁদ দেখেই ছওম রাখা সমাপ্ত করতে হবে অর্থাৎ ঈদ করতে হবে। ২৯ তারিখে চাঁদ না দেখা গেলে ৩০ তারিখ পূর্ণ করে নিতে হবে। এই বিধানটি ছহীহ হাদীছভিত্তিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রতি ব্যক্তি গ্রাম কিংবা প্রতিটি থানা ও জেলার লোককে চাঁদ দেখতেই হবে। বরং কোন দূরবর্তী এলাকার বিশ্বস্ত লোক চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে সেই সংবাদে ছওম রাখা এবং ছওম ত্যাগ করা অর্থাৎ ঈদ করা যাবে। এর প্রমাণে ছহীহ সূত্র থেকে একটি হাদীছ পাওয়া যায় যে, 'একদা কিছু লোক ছওয়ারীতে চড়ে অন্য কোন দূরবর্তী স্থান থেকে নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে সংবাদ দেয় যে তারা গতকাল ঈদের চাঁদ দেখেছে। এই খবর শুনে নবী (ছাঃ) ছাহাবাগণকে ছওম ভঙ্গ করার নির্দেশ দেন ও পরের দিন ঈদগাহে সমবেত হ'তে বলেন' (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজা, ইবুন হিব্বান/ নায়নুল আওতার 'কিতাবুছ ছাওম' ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৮৮)। উক্ত হাদীছে ঘটনাটি কোন নিকটতম অর্থাৎ ১০/১৫ মাইল দূরত্বের ঘটনা ছিলনা। কেননা এরূপ দূরত্বের ঘটনা হ'লে নবী (ছাঃ)-এর নিকট অবশ্যই সংবাদ পৌঁছে যেত এবং তিনি যথাসময়ে সে দিনেই ঈদ করতে পারতেন। আর যদি ঘটনাটি এরূপ নিকটতম দূরত্বের বলে ধরেও নেওয়া যায় তবুও ১০/১৫ মাইলের সীমা নির্ধারণ করেন নাই। কুরাইব হ'তে বর্ণিত হাদীছে শাম দেশে চাঁদ উদয়ের খবর মাদীনাবাসীর জন্য প্রযোজ্য না হওয়ার পক্ষে ইবনু আব্বাসের যে উক্তি রয়েছে তা থেকে খুব বেশী এতটুকু নেওয়া যায় যে, চাঁদ দেখা স্থানের ও চাঁদ দেখার খবর গ্রহণের স্থানের মাত্‌লা বা চাঁদ উদয় (স্থল) এক হওয়া চাই। এর অধিক নয় যেমনটি 'মির'আতুল মাফাতীহ' প্রণেতা ওবাইদুল্লাহ মুবরাকপুরী বর্ণনা দিয়েছেন। চাঁদ উদয় স্থান থেকে পূর্বে ৫৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরুত্বের লোক সেই খবরে ছওম রাখতে ও ঈদ করতে পারবে। কিন্তু চাঁদ উদয় স্থান থেকে পশ্চিমের দূরত্বে কোন সীমা নেই। এক্ষণে যদি নিখুঁত ও নির্ভূলভাবে চাঁদ দেখে রেডিও টিভিতে সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে, তবে তা গ্রহণ করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্ন-৭(৪০)ঃ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন, তাই আমি একটি ব্যবসা আরম্ভ করলাম। কিন্তু সমস্যা হ'ল এই যে, ব্যবসার অধিকাংশ মালের গায়েই প্রাণীর ছবিসহ লেবেল লাগানো থাকছে। এমতাবস্থায় সেই ছবিসহ সেই মালের ব্যবসা করা যায় কি-না?

আবুল কালাম আযাদ
সাং চককাযী মিয়া
পোঃ মুহাম্মদপুর
রাজশাহী

উত্তরঃ যে কোন প্রাণীর ছবি তোলা, ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা অথবা এমনভাবে ছবি ব্যবহার করা, যাতে ছবির প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, শারঈ দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে তা হারাম। কিন্তু আগে থেকেই অন্য কারো দ্বারা ছবি অঙ্কিত অথবা ছবি লাগোনো দ্রব্যবস্তু ব্যবহার করা কিংবা সেই দ্রব্য কেনা-বেচা করা জায়েয যদি না সেখানে ছবির প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য থাকে অথবা এমন কিছু না করে যাতে ছবির সম্মান হয়ে যায়। এর দলীল স্বরূপ নিম্নে ছহীহ হাদীছ প্রদত্ত হলঃ

হযরত মায়মুন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, ফিরিস্তা এমন বাড়ীতে প্রবেশ করেন না যে বাড়িতে কুকুর কিম্বা ছবি থাকে (বুখারী, মুসলিম)।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তিরা যারা ছবি তোলে (বুখারী, মুসলিম)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, তিনি তার ছোট্ট ঘরে একখানি পর্দা টাঙ্গিয়েছিলেন যাতে ছবি ছিল কিন্তু নবী (ছাঃ) তা দেখে ছিঁড়ে ফেলেন অতঃপর আমি তাকে দু'টি বসবার কাপ স্বরুপ বাড়িতে রেখে দিলাম, নবী (ছাঃ) তার উপর বসতেন (বুখারী-মুসলিম)। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়েছিলেন যাতে ছবি ছিল। নবী (ছাঃ) বাড়িতে প্রবেশ করলে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাকে কেটে দু'টি বালিশ করি। নবী (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন (বুখারী, নায়ল ২য় খন্ড পৃঃ ১০৩)।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা ছবি অঙ্কিত বস্তু এমনভাবে ব্যবহার করা জায়েয প্রমাণিত হয় যাতে ছবির সম্মান না হয়ে অপমান হয়। অতএব ছহীহ হাদীছের আলোকে দোকানে ছবি টাঙ্গানো যাবে না। মালের সাথে যুক্ত ছবি দোকানে প্রদর্শন করা যাবে না। তবে ছবিযুক্ত মাল বিক্রি করা যাবে যদি মাল ক্রয় বিক্রয়ের সাথে ছবি ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য না হয় এবং এমন মাল ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকতে হবে, যে মালের ক্রয়-বিক্রয় ছবির উপর নির্ভরশীল।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে ছবি বুঝাতে প্রাণীর ছবি। গাছ-পালা অর্থাৎ জড়বস্তুর ছবিতে কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্ন-৮(৪১)ঃ ছালাত আদায়ের সময় ছালাতে সূরাগুলি কি কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ করতে হবে না এর ব্যতিক্রম করেও পড়া যায়? সূরা পাঠ করার মাধ্যমে যদি সূরা ভুলে যায় কিংবা ভুলের আশংকা থাকে তবে সেই স্থানে সূরা ইখলাছ পড়ার কি বিধান রয়েছে? দলীলসহ উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আবুল কালাম আজাদ
সাং- চককাযীমিয়া
পোঃ মুহাম্মাদ পুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে সূরা পাঠের নিয়ম যেহেতু প্রথম রাক'আতে কিরাআত লম্বা করা ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআত কিছুটা খাট করা, আর কুরআনে যেহেতু প্রথমে সর্বাধিক বড় সূরা (সূরা ফাতিহা ব্যতীত) তারপর ধারাবাহিকভাবে একের তুলনায় এক ছোট সূরাগুলো সাজানো রয়েছে (সামান্য ব্যতীক্রম বাদে) তাই স্বাভাবিকভাবেই কিরাআত পাঠের নিয়ম অনুযায়ী ছালাতে সূরা পাঠে কুরআনের বিন্যাস এসেই যায় এবং কুরআনের বিন্যাস অনুসারে নবী (ছাঃ)-এর ছালাতে সূরা পাঠ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কুরআনের বিন্যাস অনুসারেই ছালাতে সূরা পাঠ অপরিহার্য। বরং আগের রাক'আতে পরের সুরা পড়ে ও পরের রাক'আতে আগের কোন সূরা পড়ে বিন্যাসের ব্যতিক্রম করা জায়েয। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য যতটুকু কুরআন পাঠ করা সহজ ততটুকু পাঠ কর' (সূরা মুযাম্মেল ২০)। সুতরাং যে কোন সূরা থেকে সুবিধা মোতাবেক কুরআন পাঠ করে ছালাত আদায় করা যায়। অপরদিকে কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী নবী (ছাঃ) ছালাতে সূরা পাঠের নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাছাড়া ছাহাবী ও তাবেঈগণের বিন্যাসের ব্যতিক্রম করে ছালাতে সূরা পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- তাবেঈ আহনাফ বিন কায়স (বিন্যাসের ব্যতিক্রম করে) প্রথম রাক'আতে সূরা কাহাফ ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইউসুফ কিংবা ইউনুস পড়েন আর বলেন যে, তিনি হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে ফজরের ছালাতে (এভাবেই) এ দু'টি সূরা পাঠ করেছিলেন (বুখারী ১ম খন্ড পৃঃ ১০৭)। এছাড়া প্রতি রাক'আতে (সুরা ফাতিহা ব্যতীত) অন্য সুরার সাথে সূরা ইখলাছ মিলিয়ে পড়া সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়েতো রয়েছেই। যা দ্বারা বিন্যাসের ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয় (বুখারী ১ম খন্ড ১০৭ পৃঃ)।

ছালাতে সূরা পাঠ করার মধ্যে সূরা ভুলে গেলে কিংবা ভুল হওয়ার আশংকা থাকলেও সেস্থানে নির্দিষ্টভাবে সূরা ইখলাছ পাঠ করার কোন শারঈ বিধান নেই। তাই বিধান মনে করে পাঠ করা উচিৎ নয়। কিরাআত যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে থাকলে সে অবস্থায় সে রুকুতে চলে যাবে নচেৎ সুবিধামত যে কোন সূরা পাঠ করে কিরাআত পূর্ণ করবে অতঃপর রুকুতে যাবে।

প্রশ্ন-৯(৪২)ঃ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে কি? বর্তমানে আমাদের দেশে তারাবীহ'র ছালাত এশা ছালাতের পরপরই পড়া হয়ে থাকে। এটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

ইমামুদ্দিন
নাচোল ,নবাবগঞ্জ

উত্তরঃ ছালাতে তারাবীহ হচ্ছে মাহে রামাযানের রাতের সেই নফল ছালাত যাকে হাদীছের পরিভাষায় ছালাতুল লায়ল ও কিয়ামে রামাযান বলা হয়। অর্থাৎ অন্য ১১ মাসে রাতের যেই ছালাতকে " তাহাজ্জুদ" বলা হয় মাহে রামাযানে সেই ছালাতকেই তারাবীহ বলা হয়। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কোন পৃথক দু'টি ছালাত নয়। মহানবী (ছাঃ) মাহে রামাযানে পৃথক পৃথকভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়তেন বলে কোন প্রকার হাদীছ নেই (নায়লুল আওতার ২য় খন্ড ২৯৫ পৃঃ মির'আতুল মাফাতীহ ২য় খন্ড ২২৪ পৃঃ)।

প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, মাহে রামাযানে লোকেরা রাতের এই ছালাত পড়ার সময় প্রতি চার রাক'আতের পর বিশ্রাম গ্রহণ করতেন তাই এই ছালাতের নাম তারাবীহ হয়ে যায়।

ছালাতে তারাবীহ পড়ার সময় সম্পর্কে এতটুকু নিশ্চিত যে, এটি রাতের ছালাত এবং ইহা 'ছালাতে এশা'-এর পরে ও ছুবহ ছাদিক হওয়ার পূর্বের মধ্যবর্তী সময়। কারণ ছালাতে এশা -এর পূর্বে কিংবা ছুবহ ছাদিকের পরে নবী (ছাঃ) -এর যুগে কেউ এই ছালাত পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বাকী রইল ছালাতে এশা-এর পরে ও ছুবহ ছাদিকের পূর্বের মধ্যবর্তী কোন সময়ে এই ছালাত আদায়ের নির্ধারিত সময়? এ সম্পর্কে বলা যায় যে, এই পূর্ণ ও দীর্ঘ সময়খানি সম্পূর্ণই 'ছালাতে তারাবীহ -এর সময়। তবে অর্ধেক রাতেই এই ছালাত পড়া উত্তম। কেননা সর্বাধিক ছহীহ সনদ সূত্রে এই ছালাত নবী (ছাঃ)-এর অর্ধেক রাতেই পড়া প্রমাণিত। যেমনটি বুখারী ১ম খন্ড ২৬৯ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর হাদীছ প্রমাণ করে। তবে অন্য হাদীছ দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, নবী (ছাঃ) এই ছালাত ছালাতে এশা এর অল্পক্ষণ পরেও পড়েছেন। যেমনটি মুসনাদে আহমাদ ৫ম খন্ড ৭-৮ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ প্রমান করে। এমনিতেই সেসময় ছালাতে এশা শেষ ও অর্ধেক রাত্রির শুরুর মধ্যে ব্যবধান খুব সামান্যই থাকত। এছাড়া নবী (ছাঃ) এই ছালাত আদায়ের জন্য রাতের কোন একটি সময়কে নির্দিষ্ট করে দেননি। ফলে মুছল্লীদের সুবিধার্থে 'ছালাতে এশা' এর পর পরই এই ছালাত আদায় করে নেওয়া যায়। তবে কেউ যদি অর্ধেক রাত্রে পড়তে চায় তবে তা আরো ভালো।

প্রশ্ন-১০(৪৩)ঃ তাবীজ লটকানো জায়েয আছে কি? কোন কোন মাওলানা বলেন যে, কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয। কথাটি কি ঠিক?

কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিবেন।

আরীফুর রহমান
গ্রামঃ চরকুড়া
পোঃ বি, জামতৈল
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীয করা যদিও কতিপয় পন্ডিত জায়েয বলেছেন কিন্তু জায়েয হওয়ার পক্ষে তাদের নিকট তেমন কোন দলীল নেই কিছু অনুমান ছাড়া। 'আর আমি কুরআনে এমন বিষয়ও নাযিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা ও মুমিনদের জন্য রহমত' (বনী ইসরাঈল ৮৭) এই আয়াত দ্বারা তাবীয লটকানো প্রমাণ করে থাকে। কিন্ত এটি তাদের অনুমান মাত্র যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। বরং কুরআন তিলাওয়াত ও আয়াত দ্বারা ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে কুরআন থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা ছহীহ হাদীছ সম্মত। এছাড়া হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বায়হাক্বীর একটি হাদীছ থেকে তাবীয লটকানো প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেখানে এমন কোন কথা উল্লেখ নাই যা দ্বারা স্পষ্টভাবে তাবীয লটকানো প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আম্বরের ব্যক্তিগত আমল সংক্রান্ত একটি হাদীছ তাবীয লটকানোর পক্ষে পেশ করা হয় কিন্তু প্রথমতঃ সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, এটি তিনি কেবল সেই শিশুদের জন্য করতেন যারা এখনো কথা বলতে শেখেনি। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি গ্রহনযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে এর বিপক্ষে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যা দ্বারা সকল প্রকার তাবীয লটকানো নিষিদ্ধ ও শিরক প্রমাণিত হয়। যেমন- 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না আর যে ব্যক্তি কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না।' অন্য হাদীছে রয়েছে 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' আরো রয়েছে 'ঝাড় ফুঁক, তাবীযালী এবং ভালবাসা সৃষ্টি করার তাবীয ব্যবহার নিঃসন্দেহে শিরক'। উল্লেখিত তিনটি হাদীছ ছহীহ এবং মুসনাদে আহমাদ, হাকেম ও ইবনু মাজাতে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত তিনটি হাদীছে স্পষ্টভাবে সকল প্রকার তাবীয লটকানোকে শিরক করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে ঝাড়-ফুঁক করাকে শিরক বলা হলেও এর দ্বারা শুধু সেই সকল ঝাড়-ফুকে উদ্দেশ্য রয়েছে যেগুলোতে শিরকী শব্দ রয়েছে। যেমন- মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের ঝাড়-ফুঁক আমার নিকট পেশ কর, যতক্ষণ না তাতে শিরকী শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে কোন বাধা নেই' (মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৮৮)। শিরকমুক্ত শব্দে ঝাড়-ফুঁক করার শুধু অনুমতিই প্রদান করা হয়নি বরং প্রয়োজনে মহানবী (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি প্রদান করেছেন' (মুসলিম)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'বদ নজরে মহানবী (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দেন' (বুখারী মুসলিম)। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তাকে ঝাড়-ফুঁক কর তাকে বদনজর লেগে গিয়েছে' (বুখারী মুসলিম)। উল্লেখিত হাদীছত্রয় মিশকাত পৃঃ ৩৮৮।

অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, কুরআনের আয়াতকে তাবীয করে নয় বরং আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে তা থেকে চিকিৎসা নেওয়া বিধি সম্মত।

http://islaminonesite.wordpress.com